ISSN 2519-6030

উত্তরা ইউনিভার্সিটি

লেখনী

ভাষা,সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক জার্নাল

Lekhani : A Journal of Language, Literature and Culture

প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪২৩
Volume 1, January 2017

Uttara University

বাকী বিল্লাহ বিকুল*

রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধে শিক্ষাভাবনা

সারসংক্ষেপ : *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ। সাহিত্যের সব শাখায় তাঁর বিচরণ সফলতায় সমৃদ্ধ। প্রবন্ধসাহিত্যে রয়েছে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। নানাবিধ প্রবন্ধ রচনায়–সমালোচনা সাহিত্যে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন। সেক্ষেত্রে শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ এক মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। রবীন্দ্র-প্রবন্ধের ভেতরে রবীন্দ্র-ত্রয়ী প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', শিক্ষার বাহন' ও 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবন্ধ-ত্রয়ীতে শুধু তাঁর শিক্ষা ভাবনাই নয়, রয়েছে এর পিছনে নানাবিধ ঘটনা। একদিকে প্রবন্ধগুলোতে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-মানস, অন্যদিকে এই প্রবন্ধগুলো ঘিরে নানাবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। তারই এক অনুপুঙ্খ বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়াস এ-প্রবন্ধে বিদ্যমান।*

রূপ এবং রূপান্তরের ভেতরে বিধৃত রবীন্দ্র-জীবন। বাংলা সাহিত্যে সর্বত্র বিচরণকারী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুদক্ষ শিল্পী, বিস্ময়কর প্রতিভার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। যেখানে তাঁর হাতের স্পর্শ পড়েছে, সেখানেই ফলেছে সোনার ফসল। তাঁর সৃষ্টিশিল্পের বিশেষ বিশেষ ভাবনার পরিচয় কাব্যে-নাটকে-গানে-উপন্যাসে দেখতে পাই। সেখানে তিনি আনন্দের নতুন উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। তেমনি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে আনন্দের নতুন উপকরণ আবিষ্কার করেছেন এবং আমাদের চিন্তার-ভাবনার আগ্রহকে বর্তমানকে কেন্দ্র করে অতীত হতে ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত করে দিয়েছেন। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে সুবিশাল বনস্পতির সঙ্গেই কেবল তুলনা করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্য যেন যোজন-বিস্তৃত মহাসমুদ্রের মতই; তার পরিধি যেমন ব্যাপক তার গভীরতা তেমন অগাধ। শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, আত্মকথা, সাহিত্য সমালোচনা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর অনেকগুলো শিক্ষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে যেখানে তাঁর শিক্ষা বিষয়ে মৌলিক চিন্তার পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। এ সমস্ত প্রবন্ধে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব কতকগুলো আদর্শ ও চিন্তা প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত রবীন্দ্র-ভাবনাগুলো সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় মৌলিক ও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, তাতে কোনো সংশয় নেই। বিস্ময়কর যা তাহলো, রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের', শিক্ষার মিলন' ও 'শিক্ষার বাহন'-এর আবেদন এখনো ফুরিয়ে যায় নি।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ

ত্রয়ী প্রবন্ধে রবীন্দ্র-মানস

শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। তিনি মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে ১৮৯২ সালে এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন :

> এই সময়ে রাজশাহীতে আছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, যিনি 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীর কাসেম' সম্বন্ধে বই লিখে অমর হয়েছেন। আছেন আরো অনেক সাহিত্যিক। তাঁদের অনুরোধে 'শিক্ষার হেরফের' নামে প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী এসোসিয়েশন'-এ পাঠ করলেন।[১]

প্রশান্তকুমার পাল 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ প্রকাশের ইতিহাস বিবৃত করেছেন এভাবে –

> রামপুর বোয়ালিয়াতে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথ 'রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে রাজশাহী কলেজে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের' পাঠ করেন। নাটোরের মহারাজা ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সম্ভবত তাঁরই অনুরোধে সেখানে পাঠ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি রচনা করেন।[২]

উল্লেখ্য যে, পৌষ সংখ্যা সাধনায় 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুকে পত্র লিখে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাদের মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করেছিলেন।

> পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত 'শিক্ষার হেরফের' নামক প্রবন্ধের প্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আমার একান্ত বিশ্বাস স্বদেশীয় ভাষা শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে না। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত জানিতে পারিলে বাধিত হইব। যদি মতের অনৈক্য না থাকে তবে কি উপায় অবলম্বন করিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে যদি অবসর মত জানান তবে চরিতার্থ হইব।[৩]

পরবর্তীতে পত্রবাহকেরা প্রবন্ধের লেখক তাঁর বলিষ্ঠ-যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের সাধারণ জনগণ এই প্রবন্ধের মাহাত্ম বুঝতে পারে নি, তারা এ-বিষয়ে কোনো সাড়াও দেয় নি। আর তৎকালীন ইংরেজ সরকারের কাছে এটা পিঠে চাবুক মারার মতো মনে হয়েছিল।

বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, রবীন্দ্রনাথ এ-বিষয়ে তাঁর নানা লেখা, আলোচনা-সভা-সেমিনার-বক্তৃতায়, বৈচিত্র্যময় চিন্তায় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে এটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ। দুঃখের-পরিতাপের বিষয় সে সময়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে ব্যবহৃত ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক প্রভৃতির শিক্ষার বাহন ছিল ইংরেজি। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। তিনি বলতে চেয়েছেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাই শিক্ষার্থীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষায় সে পথ একপ্রকার রুদ্ধ। আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। পূর্বেই বলিয়াছি ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা সাধারণত এত অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্ট্রেন্স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায়–; তার পরেই সহসা বি.এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয়–তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই শক্তিও নাই–সবগুলা মিলাইয়া এক-একটা বড়ো বড়ো তাল পাকাইয়া একেবারে এক-এক গ্রাসে গিলিয়া ফেলিতে হয়।[৪]

গোটা বাংলাভাষী অঞ্চলের লোকজন যখন বাংলা ছেড়ে ইংরেজি রচনার মোহে অন্ধ, সে ভাষার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তখন রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন এই প্রবন্ধ। বিশেষত বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সুপারিশকৃত লেখা ছিল তখন অত্যন্ত সাহসিকতার এক অনন্য নজির। বাংলা ভাষা শিক্ষা ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে এমন সুচিন্তিত মতামতের প্রবন্ধ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে দুর্লভ। প্রবন্ধে উদ্ধৃতিতে তা ধরা পড়ে।

> এইরূপে বিশ-বাইশ বৎসর ধরিয়া আমরা যে-সকল ভাব শিক্ষা করি আমাদের জীবনের সহিত তাহার একটা রাসায়নিক মিশ্রণ হয় না বলিয়া আমাদের মনের ভারি-একটা অদ্ভুত চেহারা বাহির হয়। শিক্ষিত ভাবগুলি কতক আটা দিয়া জোড়া থাকে, কতক কালক্রমে ঝরিয়া পড়ে। অসভ্যেরা যেমন গায়ে রঙ মাখিয়া উলকি পরিয়া পরম গর্ব অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, আমাদের বিলাতি বিদ্যা আমরা সেইরূপ গায়ের উপর লেপিয়া দম্ভভরে পা ফেলিয়া বেড়াই, আমাদের যথার্থ আন্তরিক জীবনের সহিত তাহার অল্পই যোগ থাকে।[৫]

রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি আবিষ্কার করে লিখেছিলেন ত্রুটিবহুল নীরস শিক্ষা-পদ্ধতির কথা। আর যে কারণে শিক্ষার্থীদের সমগ্র ব্যক্তিসত্তার সর্বাঙ্গীন বিকাশও সাধন হয় না বলেও তিনি মনে করেছিলেন। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে নেই কোনো আনন্দ, নেই বৈচিত্র্যময়তা আর না আছে জীবনমুখী চিন্তা। যার ফলে সেই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীর হৃদয় ও স্বভাবের সঙ্গে কোনোদিনই সুষ্ঠু সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারে না–কেবল মানসিক শক্তিই ক্ষয় করে। রবীন্দ্রনাথকে এগুলো পীড়িত করেছিল। যে-কারণে তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন :

> বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমনি করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমত হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; গ্রহণশক্তি চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।[৬]

রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন বিশ্বখ্যাত কবিই ছিলেন না, তিনি দেশের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রণেতাও ছিলেন। যথার্থ শিক্ষা জাতির জীবন ও চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত মানুষ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। শিক্ষাই মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিরসমূহ বিকাশ ও চরম চিত্তোৎকর্ষ সাধনে সহায়ক হয় এবং মানুষের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করে। সে-কারণে রবীন্দ্রনাথ দেশ ও জাতির শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে শিক্ষোৎসাহী হয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার বাহন' শিক্ষা সম্পর্কিত আর এক বিশেষ প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন :

> এই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-কমিশন আসছে, দেশের সর্বত্র শিক্ষা নিয়ে আলোচনা চলছে। কবির মনে নানা প্রশ্ন জাগছে দেশ সম্বন্ধে; তার মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষাসমস্যার কথাই বেশি। তাই লিখলেন 'শিক্ষার বাহন'; কলকাতায় ফিরে রামমোহন লাইব্রেরির হলে প্রবন্ধটি পড়লেন (১০ ডিসেম্বর ১৯১৬)। কবির বক্তব্য–দেশীয় ভাষার আধারে যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ কথা তাঁর নূতন নয়–তবুও নূতন করে নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বিষয়টাকে স্পষ্ট করে ধরলেন। বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ইংরেজি ও বাংলার দুটি ধারা সৃষ্টি করার সুপারিশ করে তিনি বললেন, সাদা কালো দুই স্রোতের গঙ্গা-যমুনা-ধারায় বিভাগ থাকলেও তারা এক সঙ্গেই বয়ে চলবে।[৭]

রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন কেবল বিশ্রামের জন্যই নয়, অন্য গুরুতর নানা বিষয়ে এখানে প্রয়োজন সংঘটিত হয়েছিল। এখানে পল্লীসংগঠন কাজে যেমন মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি লেখার জগৎটাও হয়ে উঠেছিল পরম আনন্দময়। রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ বাসের ফল তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটি। এ-প্রসঙ্গে প্রশান্তকুমার পাল উল্লেখ করেছেন :

> ঘরে-বাইরে-র অগ্র-কিস্তি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধটিও লেখেন। ডাঃ ওয়াটসন শিক্ষার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরীক্ষাপদ্ধতি কঠোর করার প্রস্তাব করলে রবীন্দ্রনাথ 'টীকাটিপ্পনীতে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। বিহার প্রদেশের লেফটেনান্ট গবর্নর বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে অট্টালিকাদি শিক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন জেনে তিনি এই প্রবন্ধে তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি নিজে শান্তিনিকেতনে মাঠের মধ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন—অনাড়ম্বরতাই তার বৈশিষ্ট্য। এই কারণে ছোটো লাটের মন্তব্যটিতে তিনি পীড়া বোধ করেছেন। অবশ্য এটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ড. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশ-বিদেশের বহু পণ্ডিতকে আহ্বান করে আনছিলেন, সিনেট হলে প্রদত্ত এই বক্তৃতাগুলিতে জনসাধারণেরও প্রবেশাধিকার ছিল। ড. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভাইস-চ্যান্সেলর হয়ে এই রীতি অব্যাহত রাখেন। সিন্ডিকেট রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে এইরূপ বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৮]

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রয়াসের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন তাঁর 'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন-পাসের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখড়ার বাহিরেও ল্যাঙটার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড়ো বড়ো অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন, এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্যেমশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।[৯]

'শিক্ষার বাহন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার এই প্রস্তুতকৃত ক্ষেত্রটিকে এই প্রবন্ধে আরও প্রসারিত করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন।

> মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার বালা দাবি করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবন যাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে।[১০]

বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার এ-সমস্ত ত্রুটি ধরে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এসব নিয়ে বাঙালিরা তেমন মাথা ঘামায় নি, প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন তারা বুঝতে পারেন নি। মাতৃভাষার প্রতি তাদের দরদ তৈরি হয় নি। এক্ষেত্রে তাই প্রাবন্ধিকের দুঃখ-ক্ষোভ ঝরে পড়েছে প্রবন্ধে।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্-সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?[১১]

রবীন্দ্রনাথ ইতোপূর্বে আলোচিত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের সময় থেকেই তিনি শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার উপযোগিতা বিষয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিলেন। ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে তার কার্যকারিতাও পরীক্ষা করে দেখেছেন। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর কোনো নেতিবাচক মনোভাব ছিল না। এ-প্রবন্ধেও তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন :

এমনি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মতো মিলিয়া যায় তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা একসঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।[১২]

তারপরেও বাংলা ভাষার জন্য তাঁর একান্ত দরদ। ক্ষোভ ঝরে পড়েছে প্রবন্ধের অক্ষরে :

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক-বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক-না কিন্তু গরিবের ছেলেকে তার মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?[১৩]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও প্রত্যয়ঘনতায় সমুজ্জ্বল হয়েছে। বিশেষত তাঁর ত্রয়ী প্রবন্ধে এ-বিষয়গুলো আরো দৃঢ়পিনদ্ধ। এ-ক্ষেত্রে তার 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ আর এক উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রবন্ধটির প্রকাশনার ইতিহাস সম্পর্কে 'প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়' উল্লেখ করেছেন।

কবি যখন বিদেশে (১৯০২০-২১) সে সময়ে ভারতে আরম্ভ হয়েছে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন। ইংরেজ-সরকার-প্রভাবিত বিদ্যালয়, আদালত, আপিস সবই বর্জন করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন গান্ধীজি। এ ভাবে অসহযোগ চালাতে পারলে এক বৎসরের মধ্যে নাকি স্বরাজ লাভ হবে। দেশে ফিরে কবি দেখেন শান্তিনিকেতন অসহযোগ-আন্দোলনের একটা বড়োরকম কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কস্মিনকালেও যাঁরা রাজনীতিচর্চা করেননি তাঁরাই আজ অগ্রণী; এক বৎসরে স্বরাজ-লাভের আশায় সকলেই উৎসুক। কবি দেশে দেশে ফিরছেন বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগসূত্রের সন্ধানে, শান্তিনিকেতনকে সর্বমানবের মিলনতীর্থ করবেন এই কল্পনা মনে নিয়ে, আর সেখানেই অধ্যাপক-ছাত্র-মিত্র মিলে একটা 'সংকট' সৃষ্টি করে তুলেছেন অসহযোগের-একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস! গান্ধীজী শিক্ষালয় বয়কট করবার কথা বলেছিলেন এক বৎসরের জন্য। কথাটা নূতন নয়, পদ্ধতিও পুরোনো। কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হবে কি? জাতির চিন্তার আকাশকে কুয়াশামুক্ত করবার আকাঙ্খায় রবীন্দ্রনাথ য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে (১৫ আগস্ট ১৯২১) একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন- 'শিক্ষার মিলন'। কবির মতে য়ুরোপ যে জয়ী হয়েছে সে তার বিদ্যার জোরে; সেই বিদ্যাকে গাল পাড়তে থাকলে দুঃখ কমবে না, কেবল অপরাধই বাড়বে। কবি বললেন, আসলে বুদ্ধির ভীরুতাই হচ্ছে শান্তিহীনতার মূলে। স্বাজাত্যের অহমিকা থেকে মুক্তিলাভই শিক্ষার আসল লক্ষ্য; আমাদের দেশের বিদ্যায়তনগুলিকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলনকেন্দ্র করে তুলতে হবে।[১৪]

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে রচিত ও নানাদিক নিয়ে আলোচিত রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

> ...গত শনিবার [৬ আগষ্ট] কলাভবনে পূজনীয় গুরুদেব 'শিক্ষার মিলন' নামক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তৎপর তিনি উক্ত বিষয়ে উপস্থিত সভ্যমহোদয়গণের সহিত কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন।...বর্ষাসংগীত অনুষ্ঠানের পরে ২৯ শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় গেলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী এইদিন 'শিক্ষার মিলন' পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।... পনেরো আগষ্ট য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কবি-সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করলেন। ... 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পুস্তিকা ছাড়াও ভাদ্র-সংখ্যা সবুজ পত্র এবং আশ্বিন-সংখ্যা প্রবাসী ও ভারতী-তে মুদ্রিত হয়।[১৫]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুল আলোচিত এই প্রবন্ধ পাঠ নিয়ে সে সময় নানা উত্তেজকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে যা জানা যায় তাহলো :

> অনুষ্ঠানটির জন্য যদিও আমন্ত্রণপত্রের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু বিপুল জনতা প্রবেশাধিকারের আশায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও দুপুর বারোটা থেকেই হলের সামনে সমবেত হতে আরম্ভ করে। বিকেল চারটের মধ্যেই বিশাল হলটি তার ব্যালকনি ও করিডর-সমেত জনাকীর্ণ হয়ে যায়। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ প্রবেশদ্বারের কাছে জনতার চাপে শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ঠিক সেই সময়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত হলে ছাত্রেরা প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতে থাকে। অনেক কষ্টে পিছনের একটি দরজা দিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। পৌনে ছ'টা নাগাদ আশুতোষ চৌধুরী ও অ্যান্ডরুজকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সভাস্থলে আসেন। তাঁকে দেখেই জনতা আরও উত্তাল হয়ে উঠে জোর করে ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকগুলি কাঁচের শার্সি ভেঙে ফেলে। ভিতরে আর তিল ধারণের জায়গাও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ হলের ভিতর প্রবেশ করলে সমাগত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে হর্ষধ্বনি করে তাঁকে স্বাগত জানান। আশুতোষ চৌধুরী তাঁকে মাল্যভূষিত করে বলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্প্রতি জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ ও সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখে এসেছেন। তিনি বহুদিন ধরেই জাতীয় শিক্ষার পন্থাপদ্ধতি নিয়ে চিন্তা করেছেন। এখন তাঁর মুখ থেকেই জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে তাঁর মতামত জানার সুযোগ পাওয়া যাবে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ পাঠ করতে উঠলে জনতা 'বন্দে মাতরম্', 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' প্রভৃতি ধ্বনি দেয়। এই ধ্বনি শুনেই জনতার মনোভাব বোঝা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শক্ত ছিল না, কিন্তু তিনি নির্বিকারভাবে 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি পাঠ করে যান। অবশ্য তার আগে শ্রোতাদের অনুরোধ করেন, তারা যেন পাঠের মাঝখানে করতালি না দেন; কারণ তিনি জানেন শ্রোতারা সবরকম বিদেশী জিনিস পরিত্যাগ করেছেন, আর করতালি দেওয়াটা স্বদেশী প্রথা নয়। পরিশেষে রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ধন্যজ্ঞাপক প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও বিপিনচন্দ্র পাল তা সমর্থন করলে সভাভঙ্গ হয়।[১৬]

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি নিছক কোনো সহজ অনুভূতির প্রকাশ নয়, জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকই এই প্রবন্ধ রচনার প্রধান উৎস। এই প্রবন্ধের নেপথ্যে আছে কবি-জীবনে সংঘটিত একটি সমকালীন ঘটনা। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ আলোড়িত। রবীন্দ্রনাথ বিদেশ অর্থাৎ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া কবি-মানসে কিরূপ ছায়াপাত করিয়াছে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিবেদন স্বরূপে পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধটি প্রণীত হয়। প্রবন্ধটির বক্তব্যে জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১৭]

এ বিষয়ে আরও উল্লেখ করা যায় :

> অসহযোগ ও বয়কট-সমর্থক পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদটি এল হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখনী থেকে, তিনি 'শিক্ষার বিরোধ' প্রবন্ধটি লিখে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন'-এ পাঠ করেন ও সেটি রবীন্দ্র-বিরোধী অসহযোগী নেতা চিত্তরঞ্জন দাসের পত্রিকার অগ্র-সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।[১৮]

শরৎচন্দ্রের লেখা এ-প্রবন্ধটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল মানের। সে-কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে এক সময় লজ্জিতও হন। এবং তাঁকে পত্র লিখে আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনাবহুল সময়ের সেই চিঠিটির কিছু অংশ নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

> ছেলেদের মুখে মুখে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে আপনি আমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। উত্তেজনার সময় রাগের মুখে হয়ত আপনার সম্বন্ধে মিথ্যা কিছু বলিয়া থাকিব–ইংলণ্ডের ব্যবহারে আপনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং সমস্তই ওই পাঞ্জাব চিঠিখানার জন্য, ওটা না লিখিলে এ সকল কিছুই হইতে পারে না–এই কথাগুলা আমি যে ঠি কি ভাবে তখন বলিয়াছিলাম আমার মনে নাই, বানাইয়া মিথ্যা কথা আমি সচরাচর বলি না, কিন্তু বলা একেবারেই যে অসম্ভব তাহাও নয়। অন্তত, এ সব নিশ্চয়ই বলিয়াছি যে এবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আপনি অনেক বদলাইয়া গিয়াছেন এবং বাঙলা দেশের লোকের প্রতি আপনার পূর্বের সে স্নেহ মমতা আর নাই। চরকা, নন-কো-অপারেশন প্রভৃতির উপর আপনার কোন আস্থা বা বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনার নিকট হইতে একদিন আমি রাগ করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহার পরেই হয়ত কতকগুলা মিথ্যা কথা প্রচার করিয়া থাকিব। হয়ত আমার মনের মধ্যে এ ভাব ছিল যে লোকে ভুল বুঝে ত বুঝুক। আপনার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু এই প্রথম বলিয়া আমাকে মার্জনা করিবেন।... আপনার অনেক শিষ্যের মধ্যে আমিও একজন, তাহাদের মত এত কাল আমিও কখনো আপনার নিন্দা করিতে যাই নাই, কিন্তু এবার কেন যে আমার এরূপ দুর্বুদ্ধি হইল জানি না।[১৯]

অসহযোগ, বয়কট-সমর্থক তথা সর্বদেশব্যাপী রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ পাঠে যে বিতর্কের শুরু হয়েছিল, তাতে প্রাবন্ধিক বিচলিত হন নি। বরং তাদের একটা সমুচিত জবাব দেয়ার জন্য সে সময় লিখেছিলেন 'সত্যের আহ্বান' নামক প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় :

> 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি কোনো বক্তব্য প্রকাশ করেননি। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধপাঠের পরে সংবাদপত্রে ও মৌখিক আলোচনায় তাঁর সম্পর্কে এমন মন্তব্য করা শুরু হল যে, রবীন্দ্রনাথ মনে করলেন এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে জানানোই ভালো। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সত্যের আহ্বান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে ১৩ ভাদ্র য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হলে একটি সভায় পাঠ করলেন।[২০]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিটি প্রবন্ধই চিন্তার প্রসার, গভীরতা ও প্রত্যয়ঘনতায় সমুজ্জ্বল হয়েছে। তন্মধ্যে ব্যতিক্রম ও বহুল আলোচিত-সমালোচিত প্রবন্ধ ছিল 'শিক্ষার মিলন'। রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে গান্ধীর সমালোচনা থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে ভিন্নমত পোষণ, ইউরোপ-জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থা, এবং তাঁর আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কেমন হবে, সে বিষয়ে একটি চমৎকার দর্শন ফুটিয়ে তুলেছিলেন প্রবন্ধে। তিনি লক্ষ করেছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজির দেশবাসী বিনা বিচারে মেনে চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে মত প্রদান করেছিলেন :

> পশ্চিমদেশে পোলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ বিকাশ হতে আরম্ভ হয়েছে কখন থেকে? অর্থাৎ কখন থেকে দেশের লোক এই কথা বুঝেছে যে, রাষ্ট্রনিয়ম ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের খেয়ালের জিনিস নয়, সেই নিয়মের সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সম্মতির সম্বন্ধ আছে? যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচনায় তাদের মনকে ভয়মুক্ত করেছে। যখন থেকে তারা জেনেছে, সেই নিয়মই সত্য যে নিয়ম ব্যক্তিবিশেষের কল্পনার দ্বারা বিকৃত হয় না, খেয়ালের দ্বারা বিচলিত হয় না।[২১]

ভারতমাতার কৃতি সন্তান মহাত্মা গান্ধী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তা খুব বেশি পছন্দ করতেন না। তিনি লিখেছেন :

> কেউ না মনে করেন, আমি কেবলমাত্র পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের সম্বন্ধ নিয়েই এই কথাটা বলছি। যান্ত্রিকতাকে অন্তরে বাহিরে বড়ো করে তুলে পশ্চিম-সমাজে মানবসম্বন্ধের বিশ্লিষ্টতা ঘটেছে। কেননা, স্ক্রু দিয়ে আটা, আঠা দিয়ে জোড়ার বন্ধনকেই ভাবনায় এবং চেষ্টায় প্রধান ক'রে তুললে, অন্তরতম যে আত্মিক বন্ধনে মানুষ স্বতঃপ্রসারিত আকর্ষণে পরস্পর গভীরভাবে মিলে যায় সেই সৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন বন্ধন শিথিল হতে থাকে।... সেইজন্যে এই যান্ত্রিকতায় যাদের মন পেকে যায় তারা যতই ফললাভ করে, ফললাভের দিকে তাদের লোভের ততই অন্ত থাকে না। লোভ যতই বাড়তে থাকে মানুষকে মানুষ খাটো করতে ততই আর দ্বিধা করে না।[২২]

রবীন্দ্রনাথ প্রায় দেড়বছর য়ুরোপ ও আমেরিকায় অবস্থান করেছিলেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। তিনি জার্মানি দেশ সম্পর্কে সমালোচনা করে লিখেছেন :

> জার্মানি একদা শিক্ষাব্যবস্থাকে তার রাষ্ট্রনৈতিক ভেদবুদ্ধির ক্রীতদাসী করেছিল বলে পশ্চিমের অন্যান্য নেশন তার নিন্দা করেছে। পশ্চিমের কোন্ বড়ো নেশন এ কাজ করে নি? আসল কথা, জর্মনি সকল বিভাগেই বৈজ্ঞানিক রীতিকে অন্যান্য সকল জাতির চেয়ে বেশি আয়ত্ত করেছে, সেইজন্যে পাকা নিয়মের জোরে শিক্ষাবিধিকে নিয়ে স্বাজাত্যের ডিমে তা দেবার ইনক্যুবেটর যন্ত্র সে বানিয়েছিল; তার থেকে যে বাচ্ছা জন্মেছিল দেখা গেছে অন্যদেশী বাচ্ছার চেয়ে তার দম অনেক বেশি।[২৩]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চিন্তা লালন করেছেন 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে একটি আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হবে এ রকম :

> এই জন্যেই আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলননিকেতন ক'রে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা। বিষয়লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নি, সহজে মিটতেও চায় না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনে বাধা নেই। যে গৃহস্থ কেবলমাত্র আপন পরিবারকে নিয়েই থাকে, আতিথ্য করতে যার কৃপণতা, সে দীনাত্মা। শুধু গৃহস্থের কেন, প্রত্যেক দেশেরই কেবল নিজের ভোজনশালা নিয়ে চলবে না, তার অতিথিশালা চাই যেখানে বিশ্বকে অভ্যর্থনা করে সে ধন্য হবে। শিক্ষাক্ষেত্রেই তার প্রধান অতিথিশালা। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে বর্তমান কালে শিক্ষার যত-কিছু সরকারি ব্যবস্থা আছে তার পনেরো-আনা অংশই পরের কাছে বিদ্যাভিক্ষার ব্যবস্থা।[২৪]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি ও আদর্শ বর্তমান দেশের প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্যামল-স্নিগ্ধ উদার বিস্তৃত প্রকৃতির মধ্যে গভীরভাবে আত্মনিমগ্ন হয়ে যে শিক্ষা-সাধনা, তাই সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষারীতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট গবেষক অম্লান দত্ত বলেছেন – 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলেও এই রকম সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা আছে। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে বিশ্ব মানবের সম্পর্ক–এই রকম কতকগুলোসম্পর্কেও ধারণা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মূলে আছে।'[২৫]

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিশ্বপ্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য ও মাধুর্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থেকে কেবল পাঠ্যপুস্তকাবদ্ধ বিষয়াত্মক শিক্ষার দ্বারাই মানব-মন যথোচিতভাবে প্রসারিত ও বিকশিত হতে পারে না। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি ও বাংলা ভাষার দুইটি ধারা প্রণয়নের সুপরিকল্পিত নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাদা কালো দুই স্রোত গঙ্গা যমুনা ধারায় বিভক্ত থাকলেও তারা একত্রেই প্রবাহিত হয়। ইংরেজিকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে সম্যকভাবে শিক্ষা করতে হবে; কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিদেশি ভাষা বিশেষত, ইংরেজির মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলছে আনুসঙ্গিক হয়ে। সেইহেতু শিক্ষার মূল অভিপ্রায় বা লক্ষ্য হতে বিচ্যুত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ও অর্থোপার্জনের সামর্থ্যের প্রতি শিক্ষার্থীর মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত হয়। একজন গবেষক উল্লেখ করেছেন।

> শিক্ষার সঙ্গে বিত্তের ঐক্যরক্ষা সর্বত্রই অপরিহার্য, কিন্তু এও সত্য যে, শিক্ষার প্রসার একদিকে যেমন বিত্তসংগ্রহে সাহায্য করে, তেমনি আর একদিকে শিক্ষিতের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন উপায়ে বিত্ত সংরক্ষণের সাহায্যও করে থাকে। নতুন বিত্তও শিক্ষিত দল আনয়ন করে থাকে।[২৬]

রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মাধ্যমের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্বদেশের শিক্ষাবিস্তারের প্রধান বাধা ইংরেজি ভাষা। কোনো বিদেশি ভাষার সাহায্যে দেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার যে অসম্ভব, এই সহজ সত্যকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু এই উপলব্ধির অর্থ এই নয় যে, তিনি ইংরেজি-ভাষা শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। একজন উল্লেখ করেছেন :

> রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন তথা মানবভাবনার মূলে যে চলমান ও সমগ্রতাবাদী বিশ্বতত্ত্ব বিদ্যমান, তা কেবল রেনেসাঁস-প্রভাবিত নয়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহমান উৎসসমূহের গভীর অঙ্গীকার তাঁর মধ্যে এক স্বতন্ত্র বোধ সঞ্চার করেছিলো। এই বোধ বস্তুগত এবং ভাবগত উপকরণপুঞ্জের সুষম ঐক্যে সুগঠিত।[২৭]

শিক্ষার নানামুখী সমস্যা ও যথার্থ শিক্ষার সমুচিত পন্থা বিচার-বিবেচনা করে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষানীতি সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় বিশেষ মূল্যবান। বর্তমানে দেশের প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে দেশিয় জনসাধারণের মধ্যে যে অনন্ত ব্যবধান থেকে যায়, তার মূল কারণ তিনি অতি বিচক্ষণভাবে অনুসন্ধান করেছেন। দেশের প্রচলিত শিক্ষা-প্রদ্ধতির অন্যতম বিশেষ ক্রটি এই যে, সর্ববিধ শিক্ষা-কর্মই মাতৃভাষার পরিবর্তে বিদেশি অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অথচ সত্যিকার শিক্ষার ভিত্তি মাতৃভাষা ও সাহিত্যের ওপরই স্থাপিত হয়ে থাকে। শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ তুল্য–এই সহজ সত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে দৃষ্টিপাত করেছেন।

শেষকথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শিক্ষাব্রতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত প্রবন্ধসমূহ রচনা করেছিলেন। শিক্ষাবিদ হিসেবেও তাঁর যে স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, অর্থাৎ শিক্ষানীতি সম্পর্কে তাঁর মৌলিক দর্শন-চিন্তার যে গভীর স্বাক্ষর সুচিহ্নিত এবং শিক্ষা-দর্শনেরই একটি ব্যবহারিক দিক তা এই জাতীয় প্রবন্ধসমূহ হতে লাভ করা যায়। এটি অস্বীকার করবার উপায় নেই যে,রবীন্দ্রনাথ এক আদর্শ শিক্ষানীতি প্রচার করে, জাক রুশো, পেস্টালৎজি, ফ্রয়েবেল, মন্তেসরী, ডিউঈ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদগণের ন্যায় এক বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী হয়েছেন।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন সৃষ্টিকর্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। শিক্ষাই শুধু নয়, প্রবন্ধে সমাজ, দেশ, অর্থনীতি, মানবিকতা এমন কোনো দিক নেই যা কিছু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেন নি, ভাবেন নি। সৈয়দ আলী আহসান এ-বিষয়ে বলেন :

> আমরা জানি প্রত্যেক দেশে মহৎ কবির আবির্ভাব যখন ঘটে, তখন তিনি দেশের ভাষাকে রূপ দেন। তাঁর সময় পর্যন্ত সে ভাষায় যে রূপ, যে অভিব্যক্তি থাকে, সেই অভিব্যক্তিকে আরও বিচিত্র করেন। ইংল্যন্ডে শেক্সপীয়ার করেছিলেন, ইটালিতে দান্তে করেছিলেন, জার্মানিতে গ্যয়টে করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সেই কর্তব্য সাধন করেছিলেন।[২৮]

আর সে-কারণেই প্রবন্ধ সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের লেখনী যাদুতে হয়ে উঠেছে অভিনব এক শিল্পসৃষ্টি। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তার রূপায়ণের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কথা সর্বজনবিদিত। তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার সার্থক প্রয়োগের জন্য আশ্রমবিদ্যালয়, প্রকৃতির সঙ্গে বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ সংযোগ, পাঠ্য বিষয়ের সহজ সরল রূপ প্রভৃতি বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'তবে শান্তিনিকেতনের বিশেষ শিক্ষা ও উপযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করে তুলতে রবীন্দ্রনাথকে কম বেগ পেতে হয় নি। নানা দিক থেকেই তার বিরুদ্ধ ও প্রতিকূল শক্তি কাজ করেছে।'[২৯] 'শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র শিক্ষাধারার সবচেয়ে বড় কথা হলো ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে একাত্মতা।'[৩০] তেমনিভাবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ শিক্ষাগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনার চিন্তায়। 'যে সমস্ত শিক্ষার যেটা মূল সেই মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণা দেওয়াই বিশ্বভারতীর আদর্শ ছিল।'[৩১] তিনি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই জাতীয় প্রগতির প্রধান সোপান। তাই তিনি শিক্ষাকে মূলমন্ত্র করে দেশের জাতীয় জীবনকে এক নতুন রূপদান করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষার অভাবই সমষ্টি ও ব্যষ্টির জীবনে অচল অবস্থা সৃষ্টি করে, সেই অচলাবস্থা অতিক্রম করতে হলে দেশব্যাপী শিক্ষার বিস্তার চাই। 'বাবা সর্বদাই চেষ্টা করতেন ছাত্ররা শিশু অবস্থা থেকেই যাতে আত্মনির্ভর হতে শেখে।'[৩২] তাঁর ত্রয়ী প্রবন্ধে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যার কথা যেমন বিশ্লেষণ করেছেন, তেমনি তার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ত্রয়ী প্রবন্ধে দেশের বিবিধ শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষাধারার গতি-প্রকৃতি ও শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর গভীর বিচার-বিশ্লেষণ সুচিন্তিত মীমাংসার পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তথ্য-নির্দেশ

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, (কলকাতা : ষষ্ঠ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪০৭), পৃ. ৪০
২. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., বৈশাখ ১৩৯৪), পৃ. ২৩৭
৩. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, বৈশাখ ১৪০৯), পৃ. ৫৬৮
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৯
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৬
৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, সপ্তম খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., বৈশাখ ১৪০৪), পৃ. ১৩০

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৯), পৃ. ৬২৪
১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২০
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৩
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৪
১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২৫
১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনকথা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৬-১১৭
১৫. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ., প্রথম-সং., মাঘ ১৪০৭), পৃ. ১৩১-১৩৪
১৬. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩-১৩৪
১৭. অধীর দে, আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা : উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, পরিমার্জিত দ্বিতীয়-সং., মে ২০০৭), পৃ. ৪৬
১৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী, অষ্টম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
১৯. প্রশান্তকুমার পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫
২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০৭), পৃ. ৩০৬
২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষোড়শ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০
২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৫
২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৬
২৫. অম্লান দত্ত, 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন'। আবু হেনা মোস্তফা কামাল (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২), পৃ. ২০
২৬. মুহাম্মাদ কুদরত এ-খুদা, 'শিক্ষাসমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা'। আনিসুজ্জামান (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ, (ঢাকা : অবসর, প্রথম অবসর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৪২
২৭. রফিকউল্লাহ খান, রবীন্দ্র-বিষয়ক, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৩), পৃ. ২
২৮. সৈয়দ আলী আহসান, 'রবীন্দ্রনাথ'। মোবারক হোসেন (সম্পা.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১), পৃ. ৫৭
২৯. নেপাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ : শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি প্রসঙ্গে, (কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ২০০০), পৃ. ১৭৬
৩০. আশরাফ সিদ্দিকী, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, (ঢাকা : মুক্তধারা, তৃতীয় প্রকাশ, মে ১৯৮৬), পৃ. ৬৮
৩১. মৈত্রেয়ী দেবী, রবীন্দ্রনাথ গৃহে ও বিশ্বে, (কলকাতা : প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স, তৃতীয়-সং., বৈশাখ ১৩৯৪), পৃ. ১৬৭
৩২. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, (কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্‌স্, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯৫), পৃ. ৫৯